আউলিয়ার জনপদ হবিগঞ্জ

আউলিয়ার জনপদ হবিগঞ্জ

নোমান বখত চৌধুরী

সোসাইটি ফর পাকিস্তান স্টাডিজ

প্রকাশনায় : সোসাইটি ফর পাকিস্তান ষ্টাডিজ, ঢাকা।

প্রকাশ কাল : এপ্রিল, ১৯৭০

মুদ্রণে : সাঈদা প্রেস
৮, রজনী বোস লেন,
(আরমানিটোলা)
ঢাকা—১।

মূল্য : ত্রিশ পয়সা মাত্র

তরফের কথা

পূর্ব পাকিস্তানের উত্তর-পূর্ব কোণে বন-জঙ্গল, পাহাড়, খাল-বিল, নদী-নালা ঘেরা প্রকৃতির অনুপম লীলা নিকেতনের জেলা সিলেট। সিলেটের কমলালেবু ও আতর আগরের গন্ধ ভাবুক মনে ইন্ধন জোগায়।

এই সিলেটেরই অন্যতম মহকুমা হবিগঞ্জ। সিলেট জেলাকে বিভিন্ন মহকুমায় বিভক্ত করার পূর্বে হবিগঞ্জকে 'তরফ' বলা হত। এর অন্য নাম 'বার আউলিয়ার মুল্লুক'। পূর্বে এর শাসনভার বহুবার বিজাতীয়দের হাতে গিয়েছে। কোন কোন শাসকচক্রকে এ এলাকার শাসিতেরা স্রষ্টার চেয়েও ভয় করত। কথিত আছে যে, তাদের প্রবল প্রতাপে বাঘে-ছাগলে এক ঘাটে পানি খেত। তাদের হাতে পড়ে তৎকালীন সংখ্যালঘু মুছলেম সমাজও কম লাঞ্ছিত হয়নি।

কিন্তু হযরত শাহ জালালের আগমনের পরে সকল স্বেচ্ছাচারী শাসক গোষ্ঠির শাসন কার্যে যবনিকা নেমে আসে। পীর আউলিয়াদের আগমনের পর তাদের আধ্যাত্মিক শক্তিতে মুগ্ধ হয়ে সংখ্যাগরিষ্ঠ বিধর্মীগণ এছলাম ধর্ম্মে দীক্ষিত হতে থাকে। দেখতে না দেখতে পূর্ব বঙ্গের মধ্যে সিলেট জেলায় মোছলেম সম্প্রদায় সংখ্যাগরিষ্ঠ হয়ে উঠে। পীর আউলিয়াদের পদধূলি

পেয়ে সমগ্র সিলেট আজ গর্বিত। তাঁদের অনেককে কোলে রাখতে পেরে সিলেটের মাটি ধন্য হয়েছে।

হযরত শাহজালালের সময় তরফের শাসনভার ছিল ত্রিপুরার মহারাজার সামন্ত রাজা আচক নারায়ণের উপর। উত্তরে বরাক নদী, পূর্বে ভানুগাছের পাহাড়, দক্ষিণে বেজোরা পরগণা ও পশ্চিমে লাখাই—এই চতুঃসীমার মধ্যবর্তী অঞ্চল নিয়ে তরফ রাজ্য ছিল। এর রাজধানী ছিল বিশগাঁও। রাজা আচক নারায়ণ ছিলেন অত্যন্ত স্বৈরাচারি। তিনি ছিলেন অত্যাচারী শাসকদের মধ্যে আর একটি কুগ্রহ। বৈষ্ণব রাজা আচক শাসন কার্য অপেক্ষা বৈষ্ণবসুলভ পুজা-অর্চনা প্রভৃতি ধর্মকার্যে লিপ্ত থাকতে ভালবাসতেন। প্রত্যহ ভোরে রাজধানী থেকে বহু দূরে বরাক নদীতে গিয়ে গোসল করতেন। তিনি নদীর যে জায়গা গিয়ে গোসল করতেন সে জায়গাটি আজও 'স্নানঘাট' (অধুনা বাহুবল থানাধীন) নামে পরিচিত।

১৩০৩ সালের কথা। তরফ রাজ্যের অধিপতি রাজা আচক নারায়ণের নির্মম অত্যাচারের দণ্ড তখন চরম সীমায় উঠেছে। রাজ্যের সংখ্যালঘু অধিবাসী নুর উদ্দীনের একমাত্র পুত্রের বিয়ে। আত্মীয়-স্বজন সবাই এসেছে আমন্ত্রণ পেয়ে। সকলের খাবারের জন্য ইতিমধ্যেই গরু জবাই করা হয়েছে। কিন্তু গরু জবাইয়ের এ সংবাদটি সঙ্গে সঙ্গে পৌঁছে গেল রাজ-দরবারে। সংবাদ শুনে রাজা অগ্নিশর্মা হয়ে সেনাপতিকে তলব করলেন।

কিছুক্ষণের মাঝেই সেনাপতি রাজ দরবারে হাজির হলে রাজা বললেন, "রাজা আচক নারায়ণের রাজ্যে দেবতা হত্যা করার স্পর্ধা যার থাকে আমি তার মুণ্ডপাত চাই এবং এক্ষুণি।" রাজ-হুকুম অমান্য করলে সেনাপতিরও মুণ্ডপাত হতে পারে এই আশঙ্কায় তিনি রাজদরবার হতে দেবতা হত্যা (গরু জবেহ) সম্পর্কিত সংবাদাদি নিয়ে একদল অশ্বারোহী সৈন্য নুর উদ্দীনের বাড়ীতে পাঠিয়ে দিলেন। সৈন্যদল দেখে নুর উদ্দীনের বাড়ীতে আতঙ্কের সঞ্চার হলো।

সকলেই জানে রাজার অত্যাচারের কাহিনী। কিন্তু তারা জানতেন না তাদের অপরাধ কি? তারা কল্পনাও করতে পারেন নি যে গরু জবেহ করাই তাদের একমাত্র অপরাধ। অবশেষে নুর উদ্দীন ও তার সদ্য বিবাহিত পুত্র সেনাদলের সহিত রাজ-দরবারে হাজির হলেন। নুর উদ্দীন অনুনয়-বিনয় করে রাজাকে বললেন, "আমরা আপনার প্রজা, ইচ্ছে করলে প্রজার অপরাধটুকু মার্জনা করে দিতে পারেন।"

ক্রোধান্বিত রাজা বললেন, "আমার রাজ্যে গো-হত্যা? এ আমি কিছুতেই সহ্য করতে পারব না। দেবতা বধের দুঃসাহস যারা রাখে বেতন ভোগী জল্লাদের তলোয়ারই তাদের আশ্রয়।" যো-হুকুম। সে কাজ হল, কোন হেরফের হল না।

হযরত শাহজালাল এহেন অন্যায় ও দুঃখজনক সংবাদ শ্রবণ করে সৈয়দ নাসির উদ্দীনের সমভিব্যহারে বারজন আউলিয়াকে তরফ অভিযানে পাঠিয়ে দেন।

এদিকে "গৌর গোবিন্দের পরাজয় বার্তা শ্রবণের পর আচক নারায়ণ রণনিপুণ মুসলমান সৈন্যের সহিত তাহার যুদ্ধ বৃথা লোকাক্ষয় ব্যতীত কোন লাভ হইবে না বুঝিয়া রাজধানী ত্যাগ করিয়া পরিজনসহ ত্রিপুরায় আশ্রয় গ্রহণ করেন এবং তথায় নিরাপত্তা বিপন্ন বোধে বৈষ্ণব তীর্থ মথুরায় গমন করিয়া তথায় মৃত্যু মুখে পতিত হন। (ঈদ সংখ্যা বেগম, ১৯৬৭) এ এম্পর্কেও মতভেদ রয়েছে।

কথিত আছে যে, রাজা পলায়নের সময় সৈয়দ নাসির উদ্দিন আচক নারায়ণের অশ্বের প্রতি আঙ্গুলি নির্দেশ করে সঙ্গিগণকে আদেশ দিয়েছিলেন যে, "ইস তরফ যাও।" সেই থেকে নাকি এই অঞ্চলকে 'তরফ' বলা হয়। কেউ কেউ বলে থাকেন যে, উপরোক্ত আদেশবাণীটুকু নাকি দ্বাদশ আউলিয়ার অন্যতম আউলিয়া শাহ গাজী করেছিলেন।

তরফ বিজয়ী আউলিয়াদের মধ্যে ছিলেন—(১) সৈয়দ নাসির উদ্দীন, (২) ফতেহ গাজী, (৩) শাহ আরফিন, (৪) শাহ বদর, (৫) শাহ মজলিশ আমিন, (৬) শাহ গাজী (৭) শাহ শহীদ, (৮) শাহ তাজ উদ্দীন কোরেশী, (৯) শাহ রুকুন উদ্দীন আনসারী, (১০) শাহ সুলতান, (১১) শাহ মাহমুদ ও (১২) সৈয়দ আহমদ গেছ দরাজ। অতঃপর বিজয়ীগণ তরফে ধর্ম প্রচার করতে শুরু করেন। তাদের আধ্যাত্মিক ক্ষমতায় মুগ্ধ হয়ে অল্প দিনের মধ্যেই বিজাতীয় সংখ্যাগরিষ্ঠ বিশেষ করে হিন্দু সমাজ এছলাম ধর্ম

গ্রহণ করতে লাগল। অতঃপর তরফ বিজয়ী অধিকাংশ আউলিয়াই তরফের (হবিগঞ্জ মহকুমাধীন) বিভিন্নস্থানে স্থায়ীভাবে বাস করতে লাগলেন।

অলিগণের অলৌকিক কীর্তির বহু কথা-কাহিনী আজ কেবল বৃদ্ধ মানুষদের কাছেই শোনা যায়। এখনই তাদের কীর্ত্তিসমূহকে রূপকথার মত মনে হয়। কিন্তু তবুও তা একদিন সত্য ছিল। অতীত নিঃসন্দেহে অতীত। অতীতের অপরাধ আর গ্লানি দিয়ে বর্তমানের বিচার চলে না। অতীতের যা মহত্ত্ব, যা কল্যাণকর তাকে গ্রহণ করাই অতীত কথার আলোচনার সার। সেই দৃষ্টি-ভঙ্গীতে আলোচ্য নিবন্ধটি রচিত। অতীতের কারো অন্যায়ের জন্য আজকের কারো প্রতি কোন অহেতুক ইঙ্গিত করা এর উদ্দেশ্য নয়।

একটা বিশেষ সামাজিক পর্যায়ে আউলিয়াদের তৎপরতা ছিল প্রাগ্রসর পদক্ষেপ। তৎকালীন সমাজের পরিপ্রেক্ষিতেই তাকে বিচার করে সত্য ও মানুষের কল্যাণের জন্য আউলিয়াদের সংগ্রামী ভূমিকাটুকুকেই আমাদের সঞ্চয় করতে হবে।

সৈয়দ নাসির উদ্দিন সিপাহসালার

সৈয়দ নাসির উদ্দীন সিপাহসালার সম্পর্কে বিভিন্ন লেখক ও ঐতিহাসিকদের মধ্যে মত বিরোধ রয়েছে। কেউ কেউ বলেছেন, "'তরফ' বিজেতা সৈয়দ নাসির উদ্দিন ও হযরত শাহ জালালের সঙ্গী সৈয়দ নাসির উদ্দিন সিপাহসালার বোধ হয় ভিন্ন ব্যক্তি"। আবার অনেকে বলেছেন, "সৈয়দ নাসির উদ্দিন সিপাহসালারই বার আউলিয়ার সমভিব্যাহারে তরফ জয় করেন।" আবার অনেকে জনশ্রুতির বরাত দিয়ে সৈয়দ নাসির উদ্দীন সিপাহসালার সম্পর্কে চমকপ্রদ গল্পেরও অবতারণা করেছেন। মত বিরোধ যাই থাকুক না কেন, আমরা কোন বিতর্কে প্রবেশ করতে চাইনে। কোন লেখকের সমালোচনা করার অভিপ্রায়ও আমার নেই। সৈয়দ নাসির উদ্দীন সিপাহসালার সম্পর্কে আমি যে সকল তথ্য সংগ্রহ করতে পেরেছি নিম্নে তা'ই পরিবেশন করছি কেবল।

হযরত শাহজালালের নির্দ্দেশে তাঁর সঙ্গী সৈয়দ নাসির উদ্দীন সিপাহসালার ১৩০৩ সালে তরফ জয় করেন। তরফ বিজয়ের পর তিনি অন্য কোথাও যাননি বলে শোনা যায়। সিপাহসালার শেষ জীবন পর্যন্ত তরফেই অবস্থান করেন। মোড়ারবন্দে তাঁর মাজার

রয়েছে। খরস্রোতা খোয়াই নদীর পশ্চিম তীরে পূর্ব পশ্চিমে তাঁর মাজার অবস্থিত। মাজার পূর্ব পশ্চিমে হওয়ার কারণ সম্পর্কেও মতভেদ রয়েছে। কথিত আছে, মৃত্যুর দিন কয়েক পূর্বে সিপাহসালার তাঁর শিষ্যগণকে এই মর্মে বলেছিলেন যে, তিনি যে অবস্থায় মৃত্যু বরণ করেন সেই অবস্থায়ই যেন তাঁকে সমাধিস্থ করা হয়। হঠাৎ এক দিন ফজরের নামাজের সেজদায় তিনি এন্তেকাল ফরমান। এখন তাঁকে কোন অবস্থায় দাফন করা হবে এ নিয়ে শিষ্যগণ পড়লেন মহা-সমস্যায়। তাঁদের অনেকে বল্লেন যে, পীরের পূর্ব অনুরোধ রক্ষা করা হোক। আবার কোন কোন শিষ্য এতে দ্বিমত পোষণ করলেন। তাদের মতে শরিয়ত মোতাবেক উত্তর দক্ষিণেই সমাধিস্থ করা বাঞ্ছনীয়। শেষোক্ত দল যুক্তি বের করলেন যে, পীরের অনুরোধ রক্ষা করতে হলে তিনি যে অবস্থায় আছেন অর্থাৎ এন্তেকালের সময় তাঁর দেহ যে ভঙ্গীতে ছিল সে-ভঙ্গীতে তাঁকে কবরস্থ করা প্রয়োজন। সুতরাং দেখা যায় এন্তেকালের সময় তিনি সেজদার ভঙ্গীতে ছিলেন। অতএব, সেজদার ভঙ্গীতেই দাফন করতে হবে। কিন্তু সেজদার ভঙ্গীতে দাফন করা অসুবিধাজনক। শেষোক্ত দলের আবিস্কৃত এই অসুবিধা এড়ানোর জন্য প্রথমোক্ত মতের শিষ্যগণ আর কোন আপত্তি করলেন না। সিদ্ধান্ত হল, শরিয়ত মোতাবেক উত্তর দক্ষিণেই কবর দেয়া হবে। শেষ পর্যন্ত এই করা হল। কিন্তু শবদেহ কবরে স্থাপন করার সঙ্গে সঙ্গে এক বিকট শব্দে কবরখানা আপনা আপনিভাবে ঘুরে উত্তর দক্ষিণ হতে পূর্ব-পশ্চিমে চলে যায়।

সৈয়দ নাসির উদ্দীন সিপাহসালারের পরবর্তী বংশধর ঃ

সৈয়দ শাহ ইসরাইলের বার পুত্র ছিলেন। তাঁরা হলেন (১) সৈয়দ শাহ হেমাদ, (২) সৈয়দ শাহ তাজ জালালী, (৩) সৈয়দ ইসমাইল ওরফে ছোট মিয়া, (৪) সৈয়দ আবদুল্লা, (৫) সৈয়দ ইব্রাহীম, (৬) সৈয়দ মোহাম্মদ, (৭) সৈয়দ আবদুল্লা সানি (৮) সৈয়দ

শাহ ইয়াকুব, (৯) সৈয়দ শাহ ইলিয়াস কুদ্দুছ, (১০) সৈয়দ শাহ কামাল, (১১) সৈয়দ শাহ নুহ ও (১২) সৈয়দ কুতুব।

সৈয়দ শাহ ইলিয়াস কুদ্দুছের ৫ পুত্র ঃ—(১) সৈয়দ আবু সাঈদ, (২) সৈয়দ বদর উদ্দীন, (৩) সৈয়দ তাহমাস (৪) সৈয়দ আলমাস ও (৫) সৈয়দ সালেহ। পরবর্তী বংশধরদের আর নাম পাওয়া যায়নি। তবে সিলেটের বিভিন্ন অঞ্চলে তাঁদের বংশধর রয়েছে বলে শোনা যায়।

"সৈয়দ নাসির উদ্দীনের প্রপৌত্র ইব্রাহীম খ্যাতনামা ব্যক্তি ছিলেন। বিদ্যার্জ্জন করে তিনি বাংলার সুলতান জালাল উদ্দীন মুহম্মদ শাহ (১৪১৫—১৪৩১ খ্রীঃ) থেকে মালেকুল উলামা' উপাধি প্রাপ্ত হন ও তাঁর কন্যাকে বিবাহ করেন। (হযরত শাহ জালাল ও সিলেটের ইতিহাস, পৃঃ ৩০)।

সৈয়দ শাহ মেকাইল ওরফে বড় মিয়ার বংশধর হবিগঞ্জ থানার লস্করপুর ও সুলতানসীতে রয়েছে।

সৈয়দ শাহ ইসরাইল ছিলেন একজন কৃতী ও যশস্বী পুরুষ। অগাধ বিদ্যার্জ্জনের জন্য দিল্লীর বাদশা কর্তৃক 'মূলক-উল উলামা' সনদে ভূষিত হন। তাঁর ঔরসেই সুবিখ্যাত আউলিয়া সৈয়দ শাহ ইলিয়াস কুদ্দুছের জন্ম। জীবিত থাকা কালে তাঁর অলৌকিক ক্ষমতার কোন নজীর পাওয়া না গেলেও তাঁর এন্তেকালের পর এর একটি দৃষ্টান্ত পাওয়া গেছে। ঘরগায়ে (বর্তমানে চুনারুঘাট থানাধীন) তিনি বসবাস করতেন এবং মৃত্যুর পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত সেখানেই ছিলেন। জনশ্রুতি আছে যে, তাঁর এন্তেকালের পর তাঁকে কোথায় সমাধিস্থ করা হবে এ নিয়ে শিষ্যগণের মধ্যে বিবাদ লেগে যায়।

ঘরগায়ের শিষ্যগণের মতে তাঁকে তাঁর আস্তানার (ঘরগায়ে) পার্শ্বে সমাধিস্থ করা উচিত। আবার মোড়ারবন্দের শিষ্যগণের মতে সৈয়দ নাসির উদ্দীন সিপাহসালারের মাজারের পার্শ্বে (মোড়ারবন্দে) সমাধিস্থ করা উত্তম। বহু তর্ক-বিতর্কের পর শিষ্যগণ মতৈক্যে পৌঁছিতে না পেরে সিদ্ধান্ত নিয়া হল যুদ্ধের। যে দল যুদ্ধে জয়ী হবে সে দলের মতই কার্যকরী হবে। এই সিদ্ধান্তের পরিপ্রেক্ষিতে সৈয়দ শাহ ইসরাইলের শবদেহ নিয়ে আসা হল ঘরগাও ও মোড়ারবন্দের মধ্যবর্ত্তী অনতলা নামক স্থানে। যুদ্ধের জন্য উভয় দলই তরবারী ও অন্যান্য অস্ত্রে শস্ত্রে সজ্জিত হল। উভয় দলই খাপ হতে সুতীক্ষ্ণ তরবারী বের করেছে। সংঘর্ষের অপেক্ষা মাত্র। এমন সময় অপ্রত্যাশিত ভাবে সৈয়দ শাহ ইসরাইল উঠে বসে গেলেন ও মোড়ারবন্দ নিয়ে আসার ইঙ্গিত করলেন। তাঁকে দেখিয়া সকলেই হতবাক। আর হতবাক হবেই-না-বা কেন? যিনি কয়েক ঘণ্টা পূর্বে এন্তেকাল করেছেন, যার অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়া নিয়েই এ যুদ্ধ, তিনিই এখন জীবিত। সৈয়দ শাহ ইসরাইলের কনিষ্ঠ ভ্রাতা সৈয়দ শাহ সয়েফের মাজার শায়েস্তাগঞ্জের নিকটবর্তী দাউদ নগরে অবস্থিত।

হবিগঞ্জ থানার সৈয়দপুর ও চুনারু ঘাট থানার মোড়ারবন্দে সৈয়দ শাহ ইয়াকুবের বংশধর রয়েছে। সৈয়দপুরের নিকট ফকিরাবাদ গ্রামে তার মাজার।

সৈয়দ আলমাছ ও সৈয়দ সালেহ এর বংশধর যথাক্রমে লংলা ও খান্দুরায় রয়েছে বলে শোনা যাচ্ছে, সৈয়দ শাহ সায়েক ও তদীয় ভ্রাতুষ্পুত্র সৈয়দ শাহ ইয়াকুব ব্যতীত উপরে উল্লেখিত সকল বুজোর্গগণের মাজারই মোড়ারবন্দে অবস্থিত।

কুতুবুল আউলিয়ার মাজার

খোয়াই নদীর পশ্চিম তীর ঘেষে মোড়ারবন্দের অগণিত জাম গাছের সুশীতল ছায়ায় তার মাজার অবস্থিত। সেখানে রয়েছে কয়েক শত মাজার আর পাশাপাশি রয়েছে হাজার হাজার জাম গাছ। মনে হয় কোন অভিজ্ঞ কৃষি বিজ্ঞানি হয়ত নিজ হাতে এ গাছগুলি লাগিয়েছিলেন। কিন্তু আসলে তা' নয়। এ গাছ-গুলি কেউ কোন দিন লাগায়নি। এখানে প্রায় ৪ শ' বছরেরও পুরানো জাম গাছ রয়েছে। অনেকে বলে থাকেন, মাজার সমূহের উপর ছায়াদানের জন্যই গাছগুলির জন্ম। মোড়াবন্দের মাজার এলকায় গেলে আপনা থেকে ভক্তি ও শ্রদ্ধায় মাথা নুয়ে আসে। হৃদয়ে আসে এক অনাবিল শান্তি। এই অনুপম শান্তি লাভের জন্যই হয়ত এখানে প্রত্যহ অগণিত ভক্তের ভীড় জমে।

'কুতুবুল আউলিয়া খুব আধ্যাত্মিক শক্তির অধিকারী ছিলেন। মোড়ারবন্দে তাঁর মাজার আছে।' ইতিহাসে এর অতিরিক্ত কোন কিছু পাওয়া যায় না। ইতিহাসের গতি এখানে এসেই থেমে গেছে। ইতিহাস যেখানে নীরব, ইতিহাস যেখানে মৃত, সেখানে জনশ্রুতিই খবর, কিংবদন্তীকেই জীবন্ত বলে গ্রহণ না করে উপায় কি?

কুতুবুল আউলিয়ার আসল নাম সৈয়দ শাহ ইলিয়াস কুদ্দুছ। কিন্তু এ নাম অনেকেরই অজানা। কুতুবুল আউলিয়া নামেই তিনি জাতি ধর্ম নির্ব্বিশেষে সকলের ভক্তির পাত্র। তিনি ছিলেন মুলক উল উলামা সৈয়দ শাহ ইসরাইলের নবম পুত্র। ঘরগাঁয়ে তার জন্ম। শৈশব কাল হতেই তিনি ভাবুক ছিলেন ও নির্জ্জনে থাকতে ভালবাসতেন। পিতার নিকট হতেই শরিয়ত ও মারিফতে জ্ঞান লাভ করেন। কথিত আছে যে, হঠাৎ একদিন রাত্রে তিনি উধাও হয়ে যান! তার কোন হদিছ নেই। কোথায় গেলেন তিনি, কেউ তা জানে না। অবশেষে বহু অন্বেষণের পর এক পার্বত্যময় নির্জন স্থানে পাওয়া গেল। কিন্তু স্বাভাবিক অবস্থায় নয়। নাগেশ্বর নামক এক প্রকার গাছের ডালে ঝুলে তিনি এবাদত করছেন। দু'পা ঐ গাছের ডালের মধ্যে লতা দিয়ে বাধা, মাথা নীচের দিকে। ইতিপূর্বেই তাঁর আধ্যাত্মিক শক্তির খ্যাতি চতুর্দিকে ছড়িয়ে গেছে। তাই কেহই তার ধ্যানে বাধার সৃষ্টি করেনি। সন্ধ্যার সময় তিনি মুখ খুলতেন তখন তার ভক্তেরা মুখে খাবার তুলে দিত। নাগেশ্বর বৃক্ষের নিকটেই ছিল এক ব্রাহ্মণ বাড়ী। ব্রাহ্মণের এক কন্যা ছিল। কন্যাটি শৈশব কাল হতেই কুতুবুল আউলিয়ার এই ধ্যান দেখে আসছে। তারও ইচ্ছে হয়, আউলিয়ার মুখে খাবার নিয়ে তুলে দেয়। সে তখন বয়স্কা। যৌবনের সকল চিহ্ন তার সকল অঙ্গে। সে ভাবে, সে ব্রাহ্মণ কন্যা কোনও মুছলমানের মুখে খাবার তোলে দেয়া তার ধর্ম্মে

সইবে না। কিন্তু পরক্ষণেই আবার মনের সুপ্ত বাসনা প্রবল হয়ে উঠে। এভাবে অন্তরদ্বন্দের মধ্যে কয়েকদিন অতিবাহিত হওয়ার পর তার বাসনার নিকট সকল ভাবনা হার মানে। একদিন সন্ধ্যায় ভক্তগণের আগমনের পূর্বেই সেই ব্রাহ্মণ কন্যা আউলিয়ার মুখে নিয়ে খাবার দিলে তিনি তা' গ্রহণ করলেন। ব্রাহ্মণ কন্যাটি তখন অন্তরে এক অনুপম তৃপ্তি পেল। এই তৃপ্তির নেশায়ই বুঝি যে রোজ সন্ধ্যায় আউলিয়াকে খাবার দিত। অপর দিকে ভক্তগণ নির্দিষ্ট সময়ে খাবার নিয়ে এসে দেখত তিনি মুখ খুলছেন না। কয়েকদিন পর্যন্ত এমনিভাবে খাবার নিয়ে ফিরে যাওয়ার পর ভক্তগণ ভাবল যে, তিনি হয়তঃ আধ্যাত্মিক শক্তি বলেই খেয়ে নিচ্ছেন। হঠাৎ একদিন মুখে খাবার তুলে দেবার সময় আউলিয়া চোখ মেলে তাকিয়ে দেখলেন এক রূপসী যুবতী তার মুখে খাবার দিচ্ছে। ক'দিন হতে এবং কি উদ্দেশ্যে তাঁকে খাবার দিচ্ছে আউলিয়া ব্রাহ্মণ কন্যাটিকে জিজ্ঞেস করলে সে জানাল, বেশ কয়েক মাস হতেই সে এমন ভাবে খাবার দিচ্ছে। তার কোন উদ্দেশ্য নেই, বরং কুতুবুল আউলিয়ার মত একজন আউলিয়ার সেবা করতে পারলেই সে ধন্য। কুতুবুল আউলিয়া তখন খোদাতায়ালার দরবারে হাত তোলে মোনাজাত করলেন। সে দিন হতেই উক্ত ব্রাহ্মণ কন্যা গর্ভ ধারণ করে। অল্প ক' দিনের মধ্যেই অবিবাহিত ব্রাহ্মণ কন্যার গর্ভ সম্পর্কে সকলের মধ্যে জানাজানি হয়ে গেল। ব্রাহ্মণ পড়লেন মহাবিপদে। সমাজে তিনি মুখ দেখাতে পারছেন না। লোক লজ্জা আর কত সইবেন!

তাই সকলকে খবর দিয়ে সকলের সম্মুখেই তিনি স্বীয় কন্যার গর্ভের কারণ সম্পর্কে তাকে জিজ্ঞেস করলেন। নিঃসঙ্কোচে কন্যা জানাল যে, বৃক্ষে ঝুলন্ত কুতুবুল আউলিয়াকে খাবার খাওয়ানো ছাড়া সে কোন পুরুষেরই সংস্পর্শে যায়নি। কন্যার অবিশ্বাস্য জবাবের পর তার হাতে "তামা তুলসী" দেয়া হল। "তামা তুলসী নিয়েও সে একই উত্তর জানালে সকলেই মনে মনে ভাবলেন যে, বিনা বাতাসে যখন গাছে পাতাও নড়ে না, তখন কুতুবুল আউলিয়াই হয়তঃ এ অঘটন ঘটিয়েছেন। কিন্তু অতুলনীয় আধ্যাত্মিক শক্তির অধিকারী কুতুবুল আউলিয়ার বিরুদ্ধে এহেন দুর্ণাম প্রচার করে, কার এত দুঃসাহস? তাই বাইরে কিছু প্রকাশ না করে সকলেই মনের ভাবনা মনে চেপে বাড়ী ফিরলেন।

নির্দিষ্ট সময় অতিবাহিত হবার পর উক্ত ব্রাহ্মণ কন্যা এক অনুপম সুন্দর পুত্র সন্তান লাভ করে। মানব সন্তান না হীরের তৈরী মানব শিশুর মূর্তি, ঠাহর করা মুশকিল। কুতুবুল আউলিয়ার মোনাজাতের ফলেই ব্রাহ্মণ কন্যা গর্ভবতী হয়েছিল পরবর্তী সময়ে একথা প্রকাশ পাবার পর লোকে বলত আউলিয়ার ইঙ্গিতে চন্দ্রের টুকরো স্খলিত হয়ে ব্রাহ্মণ কন্যার গর্ভে চুরি করে প্রবেশ করেছিল। এই ঘটনার পর হতে সে এলাকাটিকে 'চন্দ্র চুরি' বলা হয় বলে জনশ্রুতি রয়েছে। অবশ্য এনিয়ে মতান্তর আছে। উক্ত পুত্রটির বয়স বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে তারও আধ্যাত্মিক শক্তির রূপ বিভিন্ন ভাবে প্রকাশ পেতে থাকে। কথিত আছে যে, ছোটবেলায় খেলার সময় কেহ যদি তাকে গালি দিত তাহলে তার মুখ বেঁকে যেত। তাকে

মারবার জন্যে হাত উঠালে সে হাত আর নামানো যেত না। এমন বহু কাহিনী আজও বৃদ্ধ লোকদের নিকট হতে শোনা যায়।

আধ্যাত্মিক মতে নাকি দেহের মধ্যে চার চন্দ্রের ভেদ রয়েছে। সেখানে নাকি মানুষের মল, মুত্র, রক্ত ও বীর্য—এই চারিটি পদার্থের প্রত্যেকটিকে "চন্দ্র" বলা হয়। কিংবদন্তী আছে যে, ঝুলন্ত অবস্থায় থাকা কালীন কুতুবুল আউলিয়ার চার চন্দ্রের মধ্যে যে কোন একটি চন্দ্র চুরি হয়েছিল বলে সে এলাকাটিকে চন্দ্রচুরি বলা হয়।

কুতুবুল আউলিয়ার এন্তেকালের পরেও তাঁর আধ্যাত্মিক শক্তির প্রমাণ পাওয়া গেছে। সে দিন এই প্রসঙ্গে বলেছিলেন, মোড়ার-বন্দের মাজারসমূহের বর্তমান খাদেম জনাব সৈয়দ আহমদ। তিনি বলেছিলেন, প্রায় ত্রিশ বৎসর আগের একটি ঘটনা। আম্রবকুল ঝরা গাছের মধ্যে সবুজ আমের সমারোহ। কিন্তু কুতুবুল আউলিয়ার মাজারের পার্শ্বের গাছটি ছিল এর ব্যতিক্রম। উক্ত আমগাছ হতে আম পাড়বার উদ্দেশ্যে সে মাজারের দিকে অগ্রসর হল। সে বুঝতে পারল, মাটিতে দাঁড়িয়ে অনায়াসেই আমগুলি নাগাল পাওয়া যাবে। তাই সে আমের দিকে হাত বাড়াল কিন্তু নাগাল পেল না। দেয়াল বেষ্টিত মাজারের দেয়ালে ভর করে হাত বাড়ালেই নাগাল পাওয়া যাবে মনে করে সে তার দেহের সমস্ত ওজন পেট দিয়ে দেয়ালের উপর রেখে হাত

বাড়িয়ে আমগুলি পেড়ে নিল। কিন্তু আম নিয়ে সে এখন আর মাটিতে নামতে পারছে না। তার পেট দেয়ালের সঙ্গে লেগে গেছে। অনেক চেষ্টা সে করল কিন্তু কিছুতেই সে দেয়াল থেকে তার পেট উদ্ধার করতে পারল না।

ধাম আলী শাহ

প্রবাদ আছে যে, পরশ পাথরের স্পর্শে লোহাও সোনা হয়ে যায়। হযরত শাহজালালের সঙ্গে ও পরে সিলেটে বহু পীর আউলিয়ার আগমন ঘটেছে। এদের মধ্যে অনেকেই সিলেটের বিভিন্ন স্থানে শেষ জীবন পর্যন্ত অবস্থান করেছেন। অনেকে আবার সিলেটের মাটিতে স্বীয় পদধূলি ফেলে চলেও গিয়েছেন। ইত্যসময়ে পীর আউলিয়াদের সাহায্য, সংস্পর্শ ও শিষ্যত্ব পেয়ে অনেক সাধারণ মানুষের জীবনে এসেছে 'পীরত্ব'। এসেছে আউলিয়াগণের অলৌকিক শক্তি। এদেরই একজন হলেন ধাম আলী শাহ। তিনি ছিলেন তরফ বিজয়ী দ্বাদশ আউলিয়ার অন্যতম আউলিয়া ফতে গাজীর শিষ্য। শিষ্য হিসেবে ধাম আলী শাহ দীর্ঘদিন পর্যন্ত ফতে গাজীর সেবা করেছেন। শেষ যৌবন পর্যন্ত তিনিও ছিলেন আর দশজন মানুষের মতই সাধারণ। কিন্তু তার জীবনেও এসেছিল 'পীরত্ব'; কখন কি ভাবে যে এই দুর্লভ জিনিসটি তিনি পেয়েছিলেন অন্য কেউ জানবে দূরে থাক, তিনি নিজেও জানতেন না। ইতিমধ্যে ফতে গাজী এন্তেকাল করেছেন।

বলাবাহুল্য, তরফ জয়ের পর তিনি মাত্র স্বল্পকাল জীবিত ছিলেন। গাজীর এন্তেকালের পর অন্যান্য শিষ্যদের মত খাম আলী শাহ যথারীতি এবাদত বন্দেগী করতে লাগলেন। কিন্তু তাদের এই এবাদত বন্দেগী সংখ্যা গরিষ্ঠ হিন্দু সমাজের সহ্য হত না। তাই ওরা ফতে গাজীর শিষ্যদেরকে ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ করতে শুরু করে। শিষ্যগণকে রাস্তায় বেরুতে দেখলে দুষ্ট প্রকৃতির লোকেরা ফিস ফিস করে হাসে, গলা খাকারী দেয়, আঙ্গুল দেখিয়ে ব্যঙ্গ করে, তাদেরকে শুনিয়ে শুনিয়ে বলে এরাও এখন ফতে গাজী হয়ে গেছে—এমনি ধরনের কত না বিদ্রূপ মন্তব্য করত—এর ইয়ত্তা নেই। গাজীর এন্তেকালে শোকে মুহ্যমান শিষ্যগণ ব্যঙ্গ-বিদ্রূপে আরও ভেঙ্গে পড়েন। বার্ধক্যের দ্বারে পা দিয়ে নেতৃস্থানীয় শিষ্য খাম আলী শাহ মৃত অতীতের বাঁকা পথে ফিরে তাকিয়ে দেখলেন সংগ্রাম বহুল জীবনের টুকরো টুকরো ছবি আজও জীবন্ত হয়ে আছে। কিন্তু আজ আর সেই সংগ্রামী বীর নেই। কাকে নিয়ে সংগ্রাম করবেন ? সেই সংগ্রামী বীর যে প্রকৃতির ডাকে বহুদিন আগেই সারা দিয়ে ফেলেছেন। হাজার হাজার বিধর্মীর বিরুদ্ধে সংগ্রাম করার সাহস আছে, কিন্তু এত শক্তি কোথায় ? এ নিয়ে তিনি অনেক মাথা ঘামালেন। অবশেষে মনে মনে স্থির করলেন শক্তি থাকুক আর না থাকুক, সংগ্রাম করতেই হবে। বিদ্রূপের পাত্র হয়ে বেচে থেকে লাভ কি ? যাক শেষ পর্যন্ত তাকে আর সংগ্রাম করতে হল না। বিনা সংগ্রামেই তারা বিদ্রূপের হাত থেকে রক্ষা পেলেন। খাম আলী শাহ যখন সংগ্রামের সিদ্ধান্তে

পৌঁছেছেন ঠিক এর দুই এক দিন পরই সোরাবই (বর্তমানেও এ গ্রামটি আছে। হবিগঞ্জ থানার সুতাং রেলষ্টেশনের নিকটে অবস্থিত) গ্রামের তৎকালীন জমিদার কাশীনাথ বিশ্বাস ধাম আলী শাহকে নিমন্ত্রণ করলেন। বলাবাহুল্য, তৎকালীন হিন্দু সমাজ ব্যবস্থায় যে কত কুসংস্কার, কত গোড়ামী ছিল, হিন্দুরা যে মুসলমানদের কত হেয় দৃষ্টিতে দেখত তা ভাষায় প্রকাশ করা প্রায় অসম্ভব। একই যুগের হিন্দু জমিদারের অস্বাভাবিক ও অপ্রত্যাশিত এই নিমন্ত্রণের পশ্চাতে যে কি মতলব লুক্কায়িত ছিল পূর্বাহ্নে ধাম আলী শাহ বুঝে উঠতে পারেননি। অনেক ভেবে চিন্তে সরল বিশ্বাসে তিনি জমিদার বিশ্বাসের নিমন্ত্রণে সাড়া দিয়ে তথায় উপস্থিত হলেন। এদিকে কাশীনাথ বিশ্বাস এক জ্বলন্ত অগ্নিকুণ্ড তৈরী করে রেখেছেন। কুণ্ডের মধ্যে কেবল লাকড়ীই দেয়া হল না। দেয়া হল বড় বড় লৌহ খণ্ড। কুণ্ডের লাকড়ী দাউ দাউ করে জ্বলছে। লৌহ খণ্ডগুলি আগুনের প্রবল উত্তাপে লাল হয়ে গেছে। লৌহখণ্ড আর লাকড়ীর টুকরো একাকার হয়ে গেছে। কুণ্ডটি এতই বৃহৎ করা হয়েছিল যে, আগুনের প্রবল উত্তাপে কুণ্ড হতে এক ফার্লং -এর ভিতর দাঁড়ানো অসম্ভব হয়ে পড়েছিল !

কাশীনাথ বিশ্বাসের মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল, ধাম আলী শাহকে শাস্তি দেয়া। তাই তাঁকে পরীক্ষা করার বরাত দিয়ে বললেন যে, তোমাকে আমি অগ্নি পরীক্ষা করতে চাই। তোমার জন্যই ঐ জ্বলন্ত অগ্নিকুণ্ড তৈরী করা হয়েছে। তুমি যদি 'ঐ অগ্নিকুণ্ডের মধ্য দিয়ে হেঁটে চলে যেতে পার তা'হলে আমরা তোমার শিষ্যত্ব

বরণ করব। আর যদি অগ্নিকুণ্ডের মধ্য দিয়ে যেতে না পার, তাহলে বুঝব, তোমরা কোন আউলীয়ার শিষ্য নও, বরং আউলীয়ার শিষ্যের নামে ভণ্ডামী শুরু করে দিয়েছ। ভণ্ডামী প্রমাণিত হলে শাস্তি স্বরূপ তোমাদের সবাইকে হাত-পা বেঁধে অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষেপ করা হবে। অতঃপর ধাম আলী শাহ মনে মনে আল্লাহকে স্মরণ করে অগ্নিকুণ্ডের মধ্য দিয়ে হেঁটে যেতে রাজী হলেন এবং ধীরে ধীরে কুণ্ডের দিকে অগ্রসর হতে লাগলেন। এদিকে তামাশা দেখার জন্য হাজার হাজার নর-নারী দূরে দাঁড়িয়ে আছে। ধাম আলী শাহ বিসমিল্লাহ বলে যেই কুণ্ডের মধ্যে পা দিলেন অমনি কুণ্ডের সমস্ত আগুন দপ করে নিভে গেল। ধাম আলী শাহের বিজয়ে উল্লাস মুখর দর্শককুল সবাই বিস্মিত হয়ে ধাম আলী শাহের নিকটে এলেন। কিন্তু এলেন না কেবল সেই নিমন্ত্রণদাতা কাশীনাথ বিশ্বাস। যারা এসেছিলেন সবাই ধাম আলী শাহের নিকট থেকে এসলাম ধর্ম্মে দীক্ষিত হলেন। কিন্তু স্বীয় প্রতিশ্রুতি লংঘন করলেন অগ্নিপরীক্ষক কাশীনাথ। এ ঘটনার পর ধাম আলী শাহের সুখ্যাতি চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়ল। অবশ্য এর পর তিনি মাত্র স্বল্পকাল জীবিত ছিলেন।

এই ধাম আলী শাহেরই গুরু তরফ বিজয়ী অন্যতম আউলিয়া ফতেহ গাজী সম্পর্কে কথিত আছে যে, তিনি ছিলেন চিরকুমার। তরফ বিজয়ের পর সকল আউলিয়াগণই ধর্ম্ম প্রচারে আত্মনিয়োগ করেন। তিনিও এর ব্যতিক্রম ছিলেন না। বেজোরা এলাকায় তিনি এসলাম ধর্ম্ম প্রচার করেছেন। রঘুনন্দন পাহাড়ের পাদদেশে

শাহাজির বাজার রেলষ্টেশনের নিকট তাঁর মাজার অবস্থিত। মাজার বেষ্টনীর প্রায় পাঁচ হাত দূরেই সিলেট-আখাউরা রেল লাইন। ট্রেন চলাচলের সময় মাজারের সম্মানার্থে মাজারের পার্শ্বে ট্রেনের গতি মন্থর করা হয়। এ লাইনে যারা যাতায়াত করেন, তারা হয়ত লক্ষ্য করেছেন যে, মাজারের কাছে গিয়ে ট্রেন পৌঁছলে ট্রেনে-অবস্থানরত যাত্রীদের মধ্য হতে শত শত যাত্রী হাত বাড়িয়ে মাজারে পয়সা দান করে থাকেন।

বর্তমানে মাজারের খাদেমের নিকট ফতে গাজীর ব্যবহৃত একটি 'খড়ম' ও একটি 'ছড়ি' সংরক্ষিত আছে। ভক্তেরা রোগ শোকের সময় খড়ম ধুয়ে পানি পান করেন। অনেকে আবার খড়ম থেকে তিলার্ধ পরিমাণ কাঠ নিয়ে 'তাবিজ' হিসেবে ব্যবহার করেন। এভাবে খড়মটি হতে তিল তিল করে কাঠ নেয়া হচ্ছে, ফলে খড়মটির নমুনা বদলে গেছে। ছড়িটি সুপারি গাছের সারের (কাঠের) তৈরী বলে মনে হয়েছে। ধরার দিকের অংশটি লোহা দিয়ে বাঁধানো।

শাহ গাজী

ইতিহাস সাক্ষ্য দিচ্ছে, হযরত শাহজালালের নির্দ্দেশে বারজন আউলিয়া তরফে আগমন করে বিনা যুদ্ধেই তরফ জয় করেন। আমারও এই মনে হয়। কারণ শাহজালালের নিকট (গৌড় গোবিন্দের আচক নারায়ণ অপেক্ষাও অধিক শক্তিশালী) শোচনীয় পরাজয়ের বার্তা অনতিবিলম্বে যদি ভারতের দিল্লী, ত্রিপুরা প্রভৃতি স্থানে চলে যাওয়া সম্ভব হয় তা'হলে সিলেট হতে ঐ সংবাদটি কি দু' বৎসরের মধ্যেও প্রায় ৭৬ মাইল দূর অবস্থিত তরফে পৌঁছতে পারেনি? বলাবাহুল্য সিলেট জয়ের যে প্রায় দুই বৎসর পর তরফ জয় করা হয়েছিল এ সম্পর্কে কোন বাদ-বিসম্বাদ নেই। কিন্তু এখানকার জনশ্রুতি ভিন্নরূপ। এ জনশ্রুতি ইতিহাসকে স্বীকার করছে না। বরং অনেকের মতে ইতিহাসে ভুল তথ্য সংযোজিত হয়েছে। জনশ্রুতি আছে যে, আউলিয়াগণ আচক নারায়ণের সহিত এক রকম যুদ্ধ করে তরফ জয় করেন।

আচক নারায়ণের অত্যাচারের প্রতিশোধ নেয়ার জন্য নদীপথে তরফ অভিমুখে রওয়ানা হয়েছেন শাহজালালের প্রেরিত আউলিয়াগণ।

ইতিমধ্যেই সংবাদটি পৌছে গেল রাজধানীর (বিশগাঁও) রাজদরবারে। জ্যোতির্বিদ্যায় বিশ্বাসী বৈষ্ণব রাজ আচক তৎক্ষণাৎ ডেকে পাঠাইলেন জ্যোতিষকে। জ্যোতিষও হাজির হলেন রাজ-দরবারে। রাজা আচক সবকিছু বিরত করে জ্যোতিষকে জিজ্ঞাসা করলেন, কি ভাবে রাজধানী রক্ষা করা যায়। অনেকক্ষণ গণনার পর জ্যোতিষ জানান যে, আউলিয়াদের আগমন-গতি প্রতিরোধ করতে না পারলে রাজধানী রক্ষা করাতো যাবেই না, অধিকন্তু রাজ্যও যেতে পারে। তাদেরকে রোধ করতে হলে বিশগাঁয়ের সম্মুখে খোয়াই নদীতে বাঁধ দিতে হবে, যেন তাদের কিস্তীর সম্মুখে অগ্রসর হতে না পারে। আর বাঁধের দু-দিকে রাখতে হবে সৈন্য মোতায়েন। অন্যথায় তারা কিস্তী ত্যাগ করে পায়ে হেটে রাজধানী আগমন করতে পারেন। তবে মোতায়েনকৃত সৈন্যদের সাবধান থাকতে হবে যেন কিস্তি ত্যাগের পূর্বে আওলিয়াগণকে আক্রমণ না করে। জ্যোতিষের নির্দ্দেশ মোতাবেক সবকিছু হল।

পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, রাজা আচক নারায়ণ বিশগাঁও থেকে 'স্নানঘাটে' গোসল করে সেখানে পূজা-অর্চ্চণা করতেন, রাজধানীতে রক্ষিত 'বেডঢোলের' আওয়াজ শুনে সেখানে প্রত্যাবর্তন করে আবার পূজা-অর্চ্চণা করতেন। একদিন যথারীতি গোসলে গিয়েছেন, ইত্যসময়ে আউলিয়াগণের কিস্তী খোয়াই নদীতে আচক নারায়ণের অভঙ্গুর বাঁধের নিকটে এসে পৌঁছে গেছে। কিংবদন্তী আছে যে, উক্ত কিস্তীতে শাহগাজী একাই ছিলেন, তাঁর সঙ্গের

অন্যান্য আউলিয়াগণ ঐ সময় উচাইলে অবস্থান করছিলেন। পুথিতে বর্ণিত গাজী ছাহেবের সঙ্গী কালু শেখ তরফ জয়ের বেশ কিছুদিন পরে তরফে এসেছিলেন বলে কিছু সংখ্যক লোকের ধারনা। তবে এতে খুবই মতবিরোধ রয়েছে। অনেকের মতে পুথিতে বর্ণিত শাহ গাজী ও তরফ বিজয়ী অন্যতম আউলিয়া শাহ গাজী একই ব্যক্তি। আবার অনেকে ভিন্ন মত পোষণ করেছেন। প্রথমোক্তদের মতে তরফ বিজয়ী শাহ গাজীকেই পুথি রচয়িতাগণ পুথিতে টেনে নিয়ে মুকুট রাজার অনুপম সুন্দরী কন্যা চম্পার সহিত প্রেম সম্পর্ক দেখিয়ে পরিণয় সূত্রে আবদ্ধ করে ছেড়েছেন। কিন্তু জনশ্রুতি আছে যে, তরফ বিজয়ী শাহ গাজী ছিলেন চিরকুমার। তার সঙ্গে পুথির শাহ গাজীর কোন সম্পর্ক নেই। একই ব্যক্তি হয়ে থাকলে পুথি রচয়িতা তার ইচ্ছামত গাজী ছাহেবের প্রেম কাহিনী বর্ণনা করেছেন। পুথিতে বর্ণিত কালু শেখের অবস্থিতিও তার কাল্পনিক বলে মনে হয়। বলাবাহুল্য, শাহ গাজী চিরকুমার ছিলেন কিনা এ সম্পর্কে ইতিহাস নীরবতা পালন করেছে। ইতিহাস নিরব রয়েছে কালু শেখের অবস্থিতি সম্পর্কেও। যারা কালু শেখ শাহ গাজীর (তরফ বিজয়ী) সঙ্গী ছিলেন বলে জোর গলায় আওয়াজ তুলছেন তাঁদের প্রমাণপত্র হচ্ছে একমাত্র পুথি। তাদের নিকট পুথি ছাড়া অন্য কোন প্রমাণ নেই। এছাড়া কেউ কোন প্রমাণ-পত্র কিংবা অন্য কোন গ্রহণযোগ্য যুক্তি দেখাতে পারবেন বলেও ভরসা নেই। জনশ্রুতি হচ্ছে- পুথিতে বর্ণিত শাহ গাজীর মাজারই গাজীপুরে অবস্থিত এবং

তাঁর মাজারের নিকটবর্তী মাজারখানা হল তাঁর সঙ্গী কালু শেখের। কিন্তু ঐতিহাসিকদের মতে গাজীপুরের সেই মাজারখানা হল তরফ বিজয়ী শাহ গাজীর, পুথিতে উল্লেখিত শাহ গাজীর নয়। তা'হলে দেখা যায় তরফ বিজয়ী গাজী ছাহেবের পার্শ্বের মাজারখানাও কোন কালু শেখের নয়। যদিও পুথি সমর্থকগণ জনৈক অজ্ঞাতনামা ব্যক্তির মাজারকে কালু শেখের মাজার বলে চালিয়ে যাচ্ছেন। বলাবাহুল্য, তরফ বিজয়ীদের সঙ্গে কালু শেখ বলে কেউ ছিলেন না।

তরফ বিজয়ী শাহ গাজী ছিলেন চিরকুমার। পুঁথিতে বর্ণিত কালু শেখ কিংবা চম্পাবতীর সাথে তার কোন সম্পর্ক ছিল না এবং তাঁর মাজারই গাজীপুরে অবস্থিত বলেই মনে করি।

'শীবের গীত গাইতে গিয়ে শম্ভুর মামার বাড়ী' পর্যন্ত চলে গিয়েছিলাম। এবার পূর্ব প্রসঙ্গে ফেরা যাক। শাহ গাজী আচক নারায়ণের বাঁধের কাছে এসে থেমে গেলেন। দেখলেন উভয় তীরে সৈন্য মোতায়েন, সম্মুখে বাঁধ; কিস্তী বেয়ে যাবার কোন উপায় নেই। কিন্তু তাঁকে কে বাধা দিতে পারে? বিছমিল্লাহ বলে গাজী ছাহেব তাঁর হাতের ছড়িটি নদীতে ফেলে দিলেন। ছড়িটি নিমিষের মধ্যেই ভেঙ্গে দিল আচক নারায়ণের গর্ব-স্তম্ভ লৌহ নির্মিত সেই বাঁধটি। অমনি কিস্তীটি আবার পূর্ব গতিতে অগ্রসর হতে লাগল। উভয় তীরের মোতায়েনকৃত সৈন্যগণ গাজী ছাহেরের প্রতি তাকিয়ে রইল শুধু। কোন কিছু বলার পূর্বে

অনুমতি না থাকায় নীরব হয়ে বসে রইল। কিস্তী এসে থেমে গেল আচক নারায়ণের বাড়ীর নিকটে।

গাজী ছাহেব ফকিরের বেসে কুলে অবতরণ করে দেবতা গৃহের নিকটে গেলেন এবং একটা সূঁচ দিয়ে সামান্য দূর থেকে ইঙ্গিত করলে দেবতা গৃহে রক্ষিত আচক নারায়ণের সুবৃহৎ লৌহ নির্মিত ঢাকটি ছিদ্র হয়ে গেল। অতঃপর বিশ্রাম গ্রহণের জন্য তিনি একটি গাছের ছায়ায় আসন গ্রহণ করলেন।

অপরদিকে আচক নারায়ণ স্নানঘাটে স্নান ও পূজা-অর্চ্চনা সমাপ্ত করে প্রাসাদে ফেরার জন্য রাজবাড়ীর বেড়ঢোলের আওয়াজের অপেক্ষা করছেন মাত্র। অনেকক্ষণ অপেক্ষা করেও বেডঢোলের কোনও শব্দ শুনিতে পাননি। এদিকে নির্দিষ্ট সময়ে যথারীতি আঘাত করা হয়েছে। কিন্তু বেডঢোলে ছিদ্র থাকায় আর শব্দ বের হয়নি। বেডঢোলের সাড়া না পেয়ে অবশেষে প্রায় বিরক্ত হয়েই আচক নারায়ণ প্রাসাদে ফিরে এসে তার মাকে জিজ্ঞেস করলেন যে, কোন মুছলমান দরবেশ এসেছিলেন কি না। এমন সময় গাজী ছাহেব আচক নারায়ণের সম্মুখে এসে বললেন— আমিই এসেছিলাম। তোমার উদ্দেশ্য কি দরবেশ ? গাজী ছাহেব ছোট্ট করে জবাব দিলেন, তোমাকে মুছলমান করতে। আচক বললেন, বেশ লুকোচুরি খেলা হবে ; যে হারবে সে বিজয়ীদের নিকট মাথা নত করবে। আচক নারায়ণের সঙ্গে একমত হলেন শাহ গাজী। অতঃপর যাদু বিস্তায় দক্ষ আচক মাছি হয়ে গিয়ে বসলেন

শাহ গাজীর গায়ে। অমনি থাবা দিয়ে গাজী ছাহেব আচক নারায়ণকে তাঁর হাতের মুষ্টির ভেতর নিয়ে বললেন, হার মেনেছ তো আচক ? আচক নারায়ণ গাজী ছাহেবের কথায় সায় দিলে তিনি তাকে ছেড়ে দিলেন। এবার গাজী ছাহেবের লুকাবার পালা। আচক নারায়ণের সম্মুখেই তিনি অদৃশ্য হয়ে গেলেন। অল্পক্ষণের মধ্যেই দেখা গেল জঙ্গল থেকে অদ্ভূতপূর্ব ব্যাঘ্র নেমে আচক নারায়ণের দিকে অগ্রসর হচ্ছে। বলাবাহুল্য, ঐ সময় বিশগাঁয়ের চতুর্দিক জঙ্গলাবৃত ছিল। বর্তমানেও সেখানে জঙ্গল পরিলক্ষিত হয়। ব্যাঘ্র দেখে আচক চীৎকার দিতে লাগলেন, 'আমি দরবেশের কাছে হার মেনেছি', 'আমি দরবেশের কাছে হার মেনেছি', 'আমি দরবেশের কাছে হার মেনেছি', '......দরবেশের কাছে হার মেনেছি।'

ধীরে ধীরে বনের বাঘ বনে চলে গেল। অল্পক্ষণ পরই গাজী ছাহেব আবার আচক নারায়ণের সম্মুখে হাজির হলেন। জনশ্রুতি আছে যে, 'আমি মার কাছ থেকে আসি', এই বলে আচক রাজবাড়ীর ভিতরে গিয়ে পশ্চাতের দিকে তার মাকে নিয়ে পালিয়ে গেলেন। সব কিছু টের পেয়েও গাজী ছাহেব কোন কিছু না বলে সোজা গিয়ে বেডঢোল ও দেবতা রক্ষিত গৃহে আজান দিলেন। সঙ্গে সঙ্গে সুবৃহৎ অট্টালিকাটি খণ্ড বিখণ্ড হয়ে ধসে পড়ল। সেই গৃহের ধ্বংসাবশেষ আজও সেখানে রয়েছে। কথিত আছে যে, আজান শুনে বেডঢোল ও দেবতা গৃহে রক্ষিত

আচক নারায়ণের দৈত্য দানব গড়িয়ে নদীতে যে দিকে পড়েছিল সেই দিকে এক গভীর খালের সৃষ্টি হয়। তদবধি সেই খালটিকে 'বেঙ্ডোলের ছড়া' বলা হয়। আজও এর অস্তিত্ব রয়েছে।

যে স্থানে (দেবতা গৃহ) শাহ গাজী প্রথম আজান দিয়েছিলেন ঠিক সেই স্থানেই তাঁর মাজার অবস্থিত। গাজী ছাহেবের মাজারে এখনও বাঘ এসে শ্রদ্ধা নিবেদন করে বলে শোনা যায়।